ফেলে আসা দিন

ফেলে আসা দিন

সুলতান আহমেদ তালুকদার

KOBI PROKASHANI

ফেলে আসা দিন
সুলতান আহমেদ তালুকদার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
আমেনা বেগম রিনা

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Fele Asa Din by Sultan Ahmed Talukder Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99576-9-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা আলহাজ আব্দুল হাফিজ তালুকদার এবং মাতা মোমেনা বেগম, যাঁদের স্নেহ-মমতা ও অনুপ্রেরণায় আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি।

প্রক্কথন

শৈশব, শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ বইটিতে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে পরিবার, স্বজন, কর্মক্ষেত্র ও সহকর্মীদের বিবিধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে হয়েছে। সাড়ে তেত্রিশ বছরের চাকরি জীবন কম সময় নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে সার্বিক জীবনের দুই পঞ্চমাংশ সময়। আমার জন্ম হয়েছিল যে সময়টিতে এবং যেই জনপদে; সেখানে ছিল না কোনো বিজলির সুবিধা, টেলিফোন সুবিধা, ছিল না এখনকার মতো এতো সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই অজোপাড়া গাঁ থেকেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহিদ নাসির উদ্দিন আহমদ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৫৪ সালে তখনকার সময়ের সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস চাকরি হিসেবে স্বীকৃত *পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস-সিএসএস* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান সরকারের *সেন্ট্রাল রেলওয়ে সার্ভিসে* যোগদান করেছিলেন। ১৯৭১ সালে হানাদার সেনাদের হাতে শাহাদত বরণকালে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে কর্মরত। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণক্রমে আমি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর্যায় পেরিয়ে ঢাকাস্থ জগন্নাথ কলেজ হতে বিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ ডিগ্রি লাভ করি। অতপর শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৯৭৩ সালে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার পদে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যোগদান করেছিলাম। এরপর চাকরি জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রম শেষে ২০০৬ সালে অবসর গ্রহণ করেছি। চাকুরিকালে যেমন নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছি, তেমনি উপভোগ করেছি চাকরি জীবনের বিবিধ বিষয়। রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে ভ্রমণ করেছি দেশের অধিকাংশ জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল। প্রশিক্ষণের সুবাদে ভ্রমণ করেছি- ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ। এই গ্রন্থে চাকরি জীবন ও জীবনাচারের সাথে সম্পৃক্ত এসব বিষয়েই মুখ্যত আলোকপাত করেছি। একইভাবে জীবনের সোনালি অধ্যায় তথা মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎসম্পৃক্ত রাজনীতির নানাবিধ অনুষঙ্গ তুলে ধরেছি। সেই নিরিখে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের

দিকগুলোও স্মৃতিকথা হতে বাদ যায়নি। এটি কোনো গল্প নয়, উপন্যাস নয়, স্রেফ যাপিত সময়ের টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা। এককথায় যা আত্মজীবনী বা জীবনের ধারাবাহিকতার নিরিখে লিখিত দিনলিপিও বলা যেতে পারে।

এ ধরনের একটি গ্রন্থ অনেকদিন ধরে লেখার ইচ্ছে পোষণ করলেও নানাবিধ কারণে সময়ের সংকটে, উদ্যোগের ঘাটতি ও গাফিলতির কারণে তা আর পূর্ণ করতে পারিনি। অবসর গ্রহণের দেড়যুগ পর অবশেষ বড় কন্যা ফারজানা সুলতানা দিনার ঐকান্তিক তাগিদে এবং মেজ মেয়ে ফারিয়া সুলতান মিমা, ছোট মেয়ে ফারহানা সুলতান, জামাতাত্রয় যথাক্রমে আহমেদ তৌফিকুর রহমান, মো. আসিফ ইকবাল আলী ও শাহনেওয়াজ উল ইসলাম চৌধুরী এবং স্ত্রী আমেনা বেগম রিনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গ্রন্থের একটি খসড়া দাঁড় করাতে সক্ষম হই। গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার চাকরিকালীন অনুজ মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক। প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন *কবি প্রকাশনী*-র স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদ। পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করেছে মাসুদ খান। এদের সকলের প্রতি রইলো আমার শুভকামনা ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে সদাশয় পাঠকগণ বিগত সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ অনুষঙ্গ সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করলে; এ প্রয়াস সার্থক হবে বলে মনে করব।

সুলতান আহমেদ তালুকদার
উত্তরা, ঢাকা।
১ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

পরিবারিক ইতিবৃত্ত ১১
আমাদের বসত বাড়ি ১৭
শৈশব ও কৈশোর ১৮
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২৪
সংস্কৃতি ও পারিবারিক কথা ২৭
হাইস্কুলের দিনগুলো ২৮
ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস ৩০
ভূতের কথা ৩১
ঈদ ও উৎসব ৩২
এসএসসি পরীক্ষা ৩৪
প্রথম ঢাকা ভ্রমণ ৩৫
প্রথম ট্রেনভ্রমণ ৩৭
কলেজ জীবন ৪০
থিয়েটার বিপর্যয় ৪৪
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ৪৬
স্নাতক : বড় দাদার বাসায় ৫০
বুলবুলের বিয়ে ও মৃত্যু ৫৪
জগন্নাথে হোস্টেল জীবন ৫৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি ৫৮
জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন ৬০
আব্বার হজব্রত পালন ৬২
মুক্তিযুদ্ধ : শহিদ নাসির উদ্দিন আহমদ ৬৩
স্বাধীনতার স্বপক্ষে তৎপরতা ৬৫
নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান ৬৬
মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ৬৭
স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষা জীবন ৭০
৭২ চাকরি জীবন
৭৫ রেলওয়ের চাকরি
৭৬ শিক্ষানবিশকাল
৮০ বরোদায় ফাউন্ডেশন কোর্স
৮৩ প্রশিক্ষণ শেষে পদায়ন
৮৫ ডিসিও পদে পদোন্নতি
৮৬ সিআরবিতে বদলি
৮৭ কল্যাণ বিভাগে পদায়ন
৮৯ পিতার মৃত্যু
৯০ মন্ত্রণালয়ে রেলপথ বিভাগে পদায়ন
৯১ গ্রেট ব্রিটেনে প্রশিক্ষণ
৯৮ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পদায়ন
৯৯ সিনিয়র সার্ভিস পুল-উপসচিব
১০৮ রেলওয়েতে প্রত্যাবর্তন
১১১ রাজশাহীর চাকরিকাল
১১৬ ভারত ভ্রমণ
১২০ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে পদায়ন
১২৩ মা-এর মৃত্যু
১২৩ তেহরান ভ্রমণ
১২৪ আন্তক্যাডার আন্দোলন
১২৫ সিটিএম-পূর্ব পদে বদলি
১২৮ যুগ্ম মহাপরিচালক পদে পদায়ন
১২৯ মহাব্যবস্থাপক-পূর্ব পদে পদায়ন
১৩১ মহাপরিচালক পদে পদোন্নতি
১৩৮ চাকরি হতে অবসর
১৪০ অবসর জীবন

পরিবারিক ইতিবৃত্ত

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের এক জমিদার পরিবারে আমি জন্মেছিলাম। যেখানে আধুনিকতা তো দূরের কথা, আজকের দিনের কোনোকিছুর লেশমাত্র ছিল না। আমাদের প্রজন্মে জন্মের সময়ে এখনকার মতো জন্ম নিবন্ধনের চলও ছিল না। এছাড়া গ্রামীণ এলাকার অভিভাবক-মহল এ বিষয়ে তেমন সচেতনও ছিলেন না, যে কারণে সন্তানদের জন্ম তারিখ লিখে রাখার ক্ষেত্রে তারা তেমন গরজ করতেন না। এক্ষেত্রে বাংলা সনের কোন মাসে সন্তান জন্ম গ্রহণ করত; তা মায়েরা কিছুটা স্মরণ রাখতেন। এছাড়া কোনো উৎসব, দুর্বিপাক তথা বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় কিংবা বিশেষ ঘটনার নিরিখে সন্তানের জন্ম সালটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্ণীত হতো। পরিশেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার নিবন্ধনের সময় স্কুলের মাস্টার সাহেবরা জন্ম তারিখ নির্ধারণের গুরু দায়িত্বটি পালন করতেন। আমার ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল আমার জন্ম তারিখ। সেই মোতাবেক আমার জন্ম ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে। এটিই আমার নিবন্ধিত জন্ম তারিখ। তদুপরি এই জন্ম তারিখ নিয়ে আমার মনে সবসময় এক ধরনের সন্দেহ-সংশয় উঁকি দিত। প্রকৃত জন্ম তারিখ জানার জন্য মনের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল প্রায়শ উঁকি দিত। যে কারণে সেই কিশোর বয়স থেকে বিভিন্ন উসিলায় আমার মা-কে এ বিষয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করতাম। জবাবে মা যা জানাতেন, তা হলো- আমি জন্মেছিলাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুইবছর পর, ভাদ্র মাসে। তারিখটা তিনি কিছুতেই স্মরণ করতে পারতেন না। সেই হিসাবে আমি হয়তো জন্মেছিলাম ১৯৪৯ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। অর্থাৎ সনদ অনুযায়ী নির্ধারিত জন্ম তারিখের প্রায় তিনমাস পূর্বে। এ কারণে চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার যখন আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেন, তখন সনদে নির্ধারিত বয়সের সাথে তিনমাস যোগ করে প্রকৃত বয়স বলে থাকি।

আমার বাবা-চাচারা ছিলেন তিন ভাই। বড় জন ছিলেন মেজ জনের চাইতে বয়সে অনেক বড়। আমার বাবাই ছিলেন সবার ছোট। আমার বড় চাচার একমাত্র ছেলের বয়স ছিল আমার বাবার চাইতেও বেশি। বড় চাচার ছেলে হিসেবে আমাদের এলাকার লোকেরা তাকে বড় মিয়া বলে সম্বোধন করত। মেজ চাচাকে মাইজা মিয়া এবং আমার বাবাকে ছোট মিয়া বলে সম্বোধন করা হতো। মেজ চাচাকে আমি কিশোর বয়স পর্যন্ত দেখলেও বড় চাচাকে দেখি নাই। তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন আমার জন্মের অনেক আগে। মেজ চাচা মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬০ সালে। সে সময় আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। বড় চাচার নাম আব্দুল আলী তালুকদার, মেজ চাচার নাম হাজি হাচন আলী তালুকদার, আর আমার আব্বার নাম আলহাজ আব্দুল হাফেজ তালুকদার। বড় চাচার ছেলের নাম হাজি আফসার উদ্দিন তালুকদার। ব্রিটিশ আমলে বোম্বে (এখনকার মুম্বাই) থেকে জাহাজে করে আমার মেজ চাচা এবং বড় চাচার ছেলে পবিত্র হজ পালন করেন। আব্বা হজ করেন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে করে সরাসরি সৌদি আরবে গিয়েছিলেন।

আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কোন এলাকা থেকে, ঠিক কত সালে কিংবা কত বছর পূর্বে উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামে এসে বসত-ভিটা গড়েছিল; তা আমি জানি না। আমার আব্বার কাছে কখনো এ বিষয়ে জানতেও চাইনি। এখন আর আমাদের বংশের মুরুব্বিদের কেউ বেঁচে নেই। যে কারণে আমাদের পূর্বপুরুষদের সলুক সন্ধান এখন আর সম্ভব নয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে এখন আমি এবং আমার বড় চাচার এক নাতি চুন্নু তালুকদার মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে বেঁচে আছি। আর বাদ বাকি যারা আছে, তারা সকলে বয়সে আমার চাইতে ছোট।

আমাদের গ্রামের বাড়িটি দোতলা একটি দালান বাড়ি। এটি নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। বাড়িটি উচ্চতার দিক দিয়ে বর্তমান কালের তিনতলা দালানের সমান। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত পাকা বাড়িগুলো সাধারণত একটু বেশি উঁচু হতো। সম্ভবত ভিতরটায় যাতে গরম কম অনুভূত হয়- শীতল থাকে, সে কারণেই এমনটা করা হতো। আমার জন্ম ওই দালান বাড়িতেই। আমার জন্মের ঠিক কত বছর পূর্বে দালানটি নির্মাণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নাই। মনে পড়ে- ছোট বেলায় দালানের কোনো এক অংশের একটি দেওয়ালে এর খোদাইকৃত নির্মাণ সন চোখে

পড়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময় ভবন মেরামতকালে তা সিমেন্টের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়, যা কেউ খেয়াল করেননি। এছাড়া বাবা-চাচাদের মৃত্যুর পর বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের দিকে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য দোতলা এবং তার উপরস্থ চিলেকোঠাটি ভেঙে ফেলা হয়। ফলে এর ঐতিহ্যিক দিকটিও উপেক্ষিত হয়। হারিয়ে যায় ভবনটির বর্ণিল সৌকর্য। আদি স্থাপত্যগত শৈলীও বিলোপিত হয়।

দালানটি পশ্চিমমুখী, *শিংদুয়ার* (বাড়ির প্রধান ফটক, সম্ভবত সিংহ দ্বার এর আঞ্চলিক উচ্চারণ) বরাবর। নিচতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত দালানটি ছিল তিনভাগে বিভাজিত। এর দক্ষিণ অংশ বড় চাচা, মধ্যের অংশ মেজ চাচা এবং উত্তরাংশ আমার বাবার জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। তবে নিচ তলার সামনের বারান্দাটা খোলা ছিল, মাঝখানে কোনো দেওয়াল ছিল না। দোতলায় সবার ওঠা-নামার জন্য একটি সিড়িই ব্যবহার করা হতো। বড় চাচা, যাকে আমি দেখি নাই, তার একমাত্র পুত্র আফছার উদ্দিন তালুকদার, যিনি তার পরিবার নিয়ে তাদের অংশে বসবাস করতেন; তাদের অংশটি দক্ষিণ পাশে হওয়াতে তারা দখিনা বাতাসের সুবিধা পেতেন। আমরা যারা মধ্যম এবং উত্তর অংশে বাস করতাম, তারা দখিনা বাতাসের সুবিধা পেতাম না। যে কারণে বছরের বেশির ভাগ সময়, বিশেষত গরমের মাসগুলোতে আমাদের দুই পরিবারের লোকেরা ঘুমাতাম খোলা ছাদে। শুধু শীত এবং বর্ষার দিনগুলোতে ঘরের ভেতর ঘুমাতাম। আমার আব্বা ছিলেন প্রায় ছয়ফুট লম্বা এবং সেই সাথে বেশ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী। যে কারণে তিনি গরম একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। একারণেই ওই ছাদের খোলামেলা পরিবেশ ছিল তাঁর জন্য অনেকটা আরামদায়ক।

বাড়িতে দোতলা দালান থাকলেও আমাদের বাড়ির মূল নান্দনিক স্থাপনা ছিল লম্বা কাচারি ঘরটি। এর মেঝে ছিল পাকা, উপরে টিনের ছাউনি। একতলা হলেও কাচারি ঘরটির উচ্চতা ছিল দোতলা ঘরের দালানের সমান। এটি উত্তর দক্ষিণে লম্বায় ছিল প্রায় ১৫০ ফুট। দালানের সমান্তরালে- সামনে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কাচারি ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। একই সারিতে উত্তর দিকে আর একটি দীর্ঘ ঘর ছিল। ছোটকাল থেকে আমরা ওই ঘরটিকে *গোলাঘর* বলতাম। কাচারি ঘর ও গোলাঘরের মাঝখানে টাওয়ারসহ টিনের নির্মিত একটি ফটক ছিল। সেই ফটক তথা গেইট দিয়েই মানুষজন বাড়ির ভিতর যাওয়া-আসা করত। ব্রিটিশ আমলে ঐ গেইটে সর্বক্ষণ পাহারাদার

পদায়িত থাকত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাহারাদারের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। বাড়ির অঙ্গনে-মূল পাকাভবন এবং কাচারি ঘর ও গোলাঘরের মাঝ বরাবর স্থানে ছিল একটি পাকা চত্বর। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমাবেশের জন্য চত্বরটি ব্যবহার করা হতো।

লম্বা কাচারি ঘরে আমাদের তিন পরিবারের স্বতন্ত্র তিনটি বৈঠকখানার অবস্থান। সেখানে ঘুমানোর জন্য জোড়া খাট, বসার জন্য চেয়ার টেবিল এবং খাবারের জন্য আলাদা ছোট একটা ডাইনিং টেবিল ছিল। বাড়ির যেই শরিকের অতিথি আসত, তারা তাদের সেই অংশে অতিথিদের বিশ্রামের, ঘুমাবার ও অপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। শরিকরা যার যার বৈঠকখানার অংশ নিজ নিজ উদ্যোগে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এছাড়া বাড়ির জামে মসজিদের ইমাম সাহেব এবং প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষকের জন্য ভিন্ন দুটি কামরা ছিল। শিক্ষকের কামরাটি ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সেই রুমে শিক্ষকের ঘুমাবার জন্য একটি চৌকি ছাড়াও লম্বা একটি টেবিল এবং তার সাথে পিছনে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থাসহ লম্বা বেঞ্চ ছিল। আমাদের সময়ের আগের এবং পরের প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা সকাল ও সন্ধ্যায় ঐ কামরায় গিয়ে শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করত। বাড়ির ছেলে মেয়ে ছাড়াও আশ-পাশের বাড়ির ২-১ জন ছাত্র আমাদের বাড়িতে এসে ওই শিক্ষকের কাছে পড়ত। এছাড়া বিশাল কাচারি ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি দীর্ঘ *হলঘর* ছিল। ওই হলঘরে তিনটি লম্বা টেবিল এবং পূর্বপাশের বেড়া ঘেঁষে লম্বা জোড়া পাটাতন ছিল। আগত লোকজনদের অনেকে সেই পাটাতনে বিছানা পেতে ঘুমাতে পারতেন। আর তিনটি লম্বা টেবিল এক সারিতে সংযুক্ত করে এক সঙ্গে অনেক লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। বিশেষত ঈদ উৎসবে, রমজান মাসের ইফতারিতে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় হলঘরের ওই টেবিলগুলো ব্যবহৃত হতো।

কাচারি ঘরের উত্তর প্রান্তের সারিতে যে গোলাঘর ছিল; সেই ঘরটিতে ধানের মৌসুম শেষে কিছু ধান সংরক্ষণ করা হতো। আমাদের এলাকার চাষিরা ঐ সময় বর্ষাকালে অল্পপরিসরে (আনুমানিক ১০ শতাংশ জমিতে) আউস ধানের আবাদ করত। আমরা যখন কিশোর ছিলাম, তখন আমাদের এলাকায় কোনো ধরনের ইরি ধানের আবাদ হতো না। এমনকি এ ধরনের ধানের নামও আমরা শুনিনি। আমাদের জমিতে যে আউস ধান উৎপন্ন হতো, তা

মাড়াইয়ের সাথে সাথে বিক্রি করে দেওয়া হতো। এসব আউস ধানের চালের ভাত আমরা খেতাম না। আউস উঠে গেলে সেই জমিতেও ভাদ্র মাসের মধ্যে আমনের চারা রোপন করা হতো। আমন ধান ছিল নানা জাতের। অগ্রহায়ণ মাসে এসব ধান পাকা শুরু হলে ধারাবাহিকভাবে জমি থেকে ধান কাটা শুরু হতো। প্রথমে কাটা হতো রাজাশাইল, তারপর কুড়ি আগ্নি, এরপর বালাম এবং সর্বশেষে কাটা হতো মোটা আমন ধান। এসব ধান তোলার পর পর বেশির ভাগই বিক্রি করা হতো। সারা বছর খাবারের জন্য আমরা শুধু *বালাম* ও মোটা ধানের চাল সংরক্ষণ করতাম। এসব ধান সেদ্ধ করার পর রোদে শুকিয়ে বস্তায় ভরে বড় নৌকায় করে রাইস মিলে নিয়ে ভাঙিয়ে চাল করে আনা হতো। এরপর ঝাড়াঝাড়ির মাধ্যমে পরিষ্কার করে বড় বড় মাটির মটকায় ভরে রাখা হতো। বালাম চাউল আনুমানিক ৫০ মণ এবং মোটা চাউল আনুমানিক ১৫০ মণসহ মোট ২০০ মণ চাউল সারা বছরের খাবারের জন্য মওজুদ করা হতো। এই ২০০ মণ চাউলের জন্য আনুমানিক ২৫০ মণ ধান সেদ্ধ করতে হতো। মোটা চাল মজুদ করা হতো মূলত বর্ষা কালের কৃষি মজুরদের খাবারের জন্য। এই মজুররা আউস ও আমন ধানের চাষাবাদের জন্য বৈশাখ মাস হতে আশ্বিনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন। তাদের তিন বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো আমাদের বাড়িতে ভিন্নভাবে। যেহেতু গোলাঘর তখন ফাঁকাই থাকত, তাই তারা এই ৫-৬ মাস আমাদের বাড়ির গোলাঘরের এক অংশে থাকতেন। সাধারণত ধান তোলার মৌসুম তথা পৌষ-মাঘ মাসে ধান বিক্রি করে বাড়তি কিছু ধান রাখা হতো গোলাঘরে। সম্ভবত এজন্যই ঘরটির নামকরণও করা হয়েছিল গোলাঘর। সেই গোলাঘরও ছিল তিন অংশে বিভাজিত। শরিকরা যার যার অংশ নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করত। শুধু গোলাঘরই নয়, বলতে গেলে বাড়ির প্রতিটি স্থাপনাই তিন শরিকের মধ্যে সমানভাবে বিভাজিত ছিল। কিন্তু এ নিয়ে কখনো কোনো মতদ্বৈততা বা বিবাদ দেখা দেয়নি। শরিকরা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ অংশ ব্যবহার করতেন। এখনও এই ব্যবস্থা আগের মতোই বহাল আছে।

ধানের বীজ বপন, চারা রোপন, ধান কর্তন ও মাড়াইয়ের সময়গুলোতে সারা বাড়ি কাজের লোকের উপস্থিতিতে মুখরিত থাকত। তাদের হই-চই, কথাবার্তা ও নানামুখী গুঞ্জরণে বাড়িতে বিরাজ করত এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে তাদের বিদায়ের পর সারা বাড়িতে

নেমে আসত নীরবতা- বিরাজ করত প্রশান্ত পরিবেশ। তখন পুরো বাড়িটা পরিণত হতো ভূতুরে বাড়িতে। লোকজনের পদচারণা ও গম গম আওয়াজ আর থাকত না। তখন বাড়ির এক এক অংশে শুধু কয়েক জন বাধা কাজের লোক থাকত। এদের কেউ ছিল গরুর রাখাল, কেউ ছিল মহিষের রাখাল, কেউবা ছিল নানা ধরনের গৃহস্থালী কাজের লোক। ধানকাটার মৌসুম এলে (অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত) উত্তর অঞ্চল থেকে, বিশেষত তখনকার ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা থেকে ধানকাটা মজুররা আমাদের বাড়িতে আসতেন। তারা বড় বড় *ঘাসি* নৌকায় করে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে ৩-৪ মাসের জন্য আসতেন। তারা আমাদের গোলাঘরে থাকতেন না। কাচারি ঘরের সামনের খোলা জায়গায় তিন দলে বিভাজিত ধান কাটার শ্রমিকরা তিনটি অস্থায়ী ঘর বানিয়ে থাকতেন। তাদের খাবারের জন্য আমাদেরকে কোনো ব্যবস্থা করতে হতো না। তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে রান্না করে খেতেন। মজুরি হিসাবে তারা পেতেন মাড়াইকৃত মোট ধানের আট ভাগের এক ভাগ। ওই এক ভাগ তারা আবার সকলে নিজেদের হিস্সা অনুযায়ী ভাগ করে নিতেন। কাজ শেষে ওইসব ঘাসি নৌকায় মজুরি বাবদ প্রাপ্ত ধান বোঝাই করে তারা তাদের দেশে ফেরত যেতেন। মজুরদের প্রধান বা সর্দারকে সবাই *ব্যাপারি* বলে সম্বোধন করতেন। এই সর্দাররা তথা ব্যাপারিরা মজুরদের মতো গায়-গতরে শ্রম দিতেন না। তারা ছিলেন অনেকটা ঠিকাদার বা ম্যানেজারের মতো। তারা ধান কাটা বা মাড়াইয়ের কাজ করতেন না কিন্তু সকলের দেখভাল করতেন, সব কাজ তদারক করতেন, বাজার ও খাবারের ব্যবস্থা করতেন এবং জমির মালিকদের সাথে মজুরদের পক্ষ হয়ে সমন্বয়কের কাজ করতেন। আমরা ছোটবেলায় একরাশ কৌতূহল নিয়ে এসব ধান মাড়াইয়ের শ্রমিকদের চাল-চলন, রান্নাবান্না, হাসি তামাশা উপভোগ করতাম। এই মৌসুমী মজুররা ধান কাটা এবং মাড়াই ছাড়াও বছরের পুরা খোরাকির জন্য সংরক্ষণীয় প্রায় ২৫০ মণ পরিমাণ ধান সেদ্ধ ও রৌদ্রে শুকানোর কাজও করতেন। এছাড়া তারা নিজেদের ঘাসি নৌকায় করে ২-৩ কিস্তিতে সিদ্ধ করা ধান রাইস মিলে নিয়ে গিয়ে ভাঙিয়ে আনতেন এবং সেসব চাল পরিষ্কার করার পর বড় বড় মটকায় তা তুলে রাখতেন। এসব কাজ সমাপ্তির পর বিদায়কালে তাদের সম্মানে বড় ভোজের আয়োজন করা হতো। একটি তৃপ্তিকর ভোজনের পর তারা প্রসন্নচিত্তে বাড়ির পথে রওয়ানা দিত নৌকা যোগে। সেসময় আমাদের এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ছিল- একমাত্র নৌ-পথ। যান চলাচলের জন্য কোনো পাকা

রাস্তা ছিল না। তার দরকারও হতো না। নায়রির গমনা-গমন থেকে হাট-বাজারের সওদাপাতি ক্রয় বা কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সব কাজই সারা হতো নৌকার মাধ্যমে। ১২ মাসই আমাদের এলাকায় নৌ-চলাচল সচল থাকত।

প্রকাশ থাকে যে, সেই সময় দক্ষিণ অঞ্চলের ছোট বড় জমিদারগণ নিজেদের নামের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের নামেও জমিজমা ক্রয় করতেন, বিশেষ করে ছেলে সন্তানদের নামে। আমার আব্বাও আমাদের ভাইদের নামে জমি কিনেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে যারা আগে জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ বড় ভাইদের নামে ছোট ভাইদের তুলনায় বেশি জমি ক্রয় করা হয়। ব্রিটিশ আমলে এমনকি পাকিস্তান আমলেও গ্রামবাংলায় বিনিয়োগের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল ভূ-সম্পত্তি, যে কারণে সম্পদ বাড়াবার জন্য কৃষিভূমি ক্রয় করা হতো। আমার জন্মের পর পাকিস্তান আমলে- অন্যান্য ভাইদের ন্যায় আমার নামেও আব্বা বেশকিছু কৃষিজমি ক্রয় করেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২-১৯৭৩ সালে তদানিন্তন সরকার জমির সিলিং বেধে দেয়। সে মোতাবেক বলা হয়- এক পরিবারে ১০০বিঘার বেশি জমি রাখা যাবে না। ১০০বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট সমর্পন করতে হবে। একই ঘোষণায় পরিবারের সংজ্ঞাও দিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়- যারা বিয়ে করেছে এবং পিতামাতার সাথে না থেকে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করছে; তারা একটি পরিবার হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি ছেলে বিয়ে করলেও যদি পিতা মাতার সাথে একত্রে বসবাস করেন- তাহলে সে পিতার পরিবারের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এই আইন তেমনভাবে আর কার্যকরী হয়নি। ফলে এ নিয়ে আমাদেরকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

আমাদের বসত-বাড়ি

বাবা-চাচারা বলতেন আমাদের গ্রামের বাড়িটি ৫৬ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা অবশ্য বাড়ির বিস্তৃতি কখনও মেপে দেখি নাই। ওই বিশাল পরিধির বাড়িটি সমান তিনভাগে ভাগ করে আমরা ব্যবহার করতাম।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিভাজিত না করলেও বাবা চাচার আমল থেকে যেভাবে শরিকানা নির্ধারিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেই রীতি এখনো বহাল আছে। এ নিয়ে এখনো কোনো দ্বান্দ্বিক বা বিব্রতকর পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয়নি।

আমার জন্মের পর থেকে আমাদের বাড়িতে ছয়টি পুকুর দেখেছি। এর মধ্যে তিন অংশে মহিলাদের ব্যবহারের জন্য তিনটি পৃথক পুকুর সংরক্ষিত। বাকি তিনটির একটি পুকুর পুরুষদের অযু ও গোসলের জন্য নির্ধারিত, একটি নির্ধারিত শুধু খাবারের পানির জন্য এবং একটি অতিরিক্ত পুকুর। এগুলোর মধ্যে পানি পান করার পুকুরটি সব চাইতে বড় আকৃতির, এটি একটি দিঘির মতো। বাড়ির লোকেরা ছাড়াও গ্রামের লোকজনও সেই পুকুর থেকে পান করার পানি সংগ্রহ করত। এই পুকুরে কেউ কখনো গোসল করত না। তবে অন্যান্য পুকুরের মতো এতে মাছ চাষ করা হতো। পরবর্তী সময়ে মাছ চাষের জন্য আরও একটি বড় পুকুর খনন করা হয়। বর্তমানে বাড়িতে মোট পুকুরের সংখ্যা সাতটি। আমাদের বাড়ির খাবার পানিও পুকুর থেকে মাটির কলসিতে করে আনা হতো। সেই পানি ফিটকারি দিয়ে শোধন করে পান করতাম। ফিটকারি দিলে মাটির কলসির নিচে পলি জমত। এজন্য কলসিতে পানি ভরার আগে প্রতিদিনই ভালো করে এর তলটা পরিষ্কার করতে হতো। পুকুর একটু দূরে হওয়াতে এবং কলসিগুলো বেশ বড় আকৃতির হওয়াতে পানি আনার কাজ কোনো কাজের মহিলা করতেন না, এসব কাজ বাড়ির পুরুষ কামলারা করত। বাড়ির পরিধিতে পারিবারিক কবরস্থান ছাড়াও ছিল একটি ঈদের মাঠ। সেখানে ঈদের দিন জামাত অনুষ্ঠিত হতো। এখনো পূর্বের ধারাবাহিকতায় সেখানে প্রতিবছর দুই ঈদে জামাত হয়ে থাকে। তবে ঈদের জামাতের জায়গাটি (ঈদগাহ) বর্তমানে অন্যত্র স্থানান্তর এবং আরও উন্নত করা হয়েছে।

শৈশব ও কৈশোর

আমাদের বাড়ির পুকুরের ডাঙায় অনেকগুলো তালগাছ ছিল। এই পুকুরগুলোর মধ্যে খাবার জলের পুকুর পারেই (আমরা এই পুকুরটিকে বলতাম বড় পুকুর) ছিল তাল গাছের আধিক্য। বর্ষাকাল তথা শ্রাবণ মাসের

শেষ দিকে তাল পেকে গাছের নিচে পড়ে থাকত। সেই তাল কুড়ানো ছিল বাড়ির শিশু-কিশোরদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি কাজ বা খেলা। আমরা মহাউৎসাহে গাছ থেকে খসে পড়া তালগুলো কুড়াতাম। এটি ছিল আমাদের জন্য এক ধরনের বিনোদন, আনন্দদায়ক খেলা। এই তাল কুড়ানোর ছলে আমরা এক ধরনের শখ মিটাতাম। প্রায়শ আমরা ভোররাতে টর্চ লাইট নিয়ে তাল কুড়াতে যেতাম। পুকুরে ও ডাঙায় টর্চের আলো ফেলে তালের সন্ধান করতাম। কুড়ানো শেষ হলে সব তাল একত্র করে কে কতটি তাল সংগ্রহ করেছি; তা গুনতে বসতাম । এই তাল কুড়ানো নিয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলত। তাল কুড়ানোর পর, সেসব তাল কে বা কারা নিয়ে যেত, তাল দিয়ে কী করা হতো, আমরা আর সে সবের খবর রাখতাম না। তাল কুড়ানোটাই ছিল আমাদের মূল বিষয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আমরা ওইসব তালের আঁটির শাঁস খুব মজা করে খেতাম। উল্লেখ্য, আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে পাকা তালের আঁটিগুলোকে যত্ন করে সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে সে সবের শাঁস দিয়ে দুধ নারেকেল সহযোগে মজার মজার উপাদেয় খাবার বানানো হতো, যা আমরা নাস্তা হিসেবে খেতাম। এ ধরনের খাবার ছিল আমাদের অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খাবার। এখন, এই আধুনিক সময়েও এ ধরনের খাবারের চল গ্রামাঞ্চলে চলমান।

বাড়ির ছোট ছেলেদের আর একটি বিশেষ আগ্রহের দিক ছিল; কাটা ধানের আঁটি গণনা করা। মাঠ থেকে ধান কাটা শ্রমিকরা ধান কেটে এনে বাড়ির সামনে বড় খোলা স্থানে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখত। স্থানীয় ভাষায় যাকে ধানের পালা বলা হতো। প্রতিদিন এই তিনভাগের মধ্যে কোন পরিবারের অনুকূলে কতগুলো আঁটি কাটা হয়েছে; তা নিয়ে শিশুদের মনে এক ধরনের উত্তেজনাকর অস্থিরতা বিরাজ করত। এটি ছিল আমাদের এক ধরনের কৌতূহল। এসব দেখে বেশ আনন্দিত হতাম। ধান কাটার মৌসুমে উত্তরাঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকরা (স্থানীয় ভাষায় তাদের ধানকাটা কামলা বলে, এদেরকে কেবল ধান কাটার জন্যই নিয়োগ দেওয়া হতো) খুব সকালে সূর্য ওঠার আগে ভাত খেয়ে ধান কাটার জন্য মাঠে যেত, সারাদিন এক নাগাড়ে ধানকাটা শেষে তারা ধানের আঁটিগুলো সুন্দর করে বড় খোলা নৌকায় সাজিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা দিত। নৌকা বাড়ির ঘাটে ভেড়ানোর পর ধানের আঁটিগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসে বাড়ির সামনের খোলা আঙিনায় সুন্দরভাবে স্তূপ করে রাখত। এর পর তারা গোসল সেরে সন্ধ্যার

কাজগুলো সেরে খেতে বসত। এই মজুরদের খাবার রান্নার জন্য আলাদা লোক ছিল। কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা প্রায়শ মজুরদের সরদারকে (বাড়ির এক এক শরিকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সর্দার থাকত) কোন শরিকের কত আঁটি ধান কাটা হয়েছে, তা জিজ্ঞাসা করতাম। যদিও এ ধরনের পরিসংখ্যান আমাদের কোনো কাজে লাগত না, তথাপি আমরা তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তাম এবং সেসব তথ্য জানার পর এক ধরনের তৃপ্তি পেতাম। যেই শরিকের যেদিন বেশি ধান বাড়িতে আসত, সেদিন সেই শরিকের ছেলেরা অর্থাৎ আমার মেজ চাচার ছেলে আমার সহপাঠি মনিরুল ইসলাম তালুকদার, আমার চাচাত ভাইয়ের ছেলে কিছলু তালুকদার, সহপাঠি অন্যান্যরা তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতাম। এ ধরনের উচ্ছ্বাস ছিল ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস। সেই সন্ধ্যাতেই তা হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। আবার পরের দিনের সন্ধ্যায় সেই দিনের ধান কাটার পরিসংখ্যান নিয়ে সূচিত হতো নয়া উৎসাহ ও আনন্দ।

এভাবেই নানামুখী আনন্দ-বেদনার দোলাচলে কেটে যেত আমাদের শিশুকাল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমাদের শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়। আমার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় আমাদের বাড়ির পাশেই উত্তর তক্তাবুনিয়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। শুরুতে আমাদের ক্লাশে আমরা মাত্র চারজন ছাত্র ছিলাম। এরা ছিলেন- আমার চাচাত ভাই মনিরুল ইসলাম তালুকদার, বড় চাচাত ভাইয়ের ছেলে কিছলু তালুকদার এবং তার বোন মুকুল বেগম। পরবর্তী সময়ে মুকুলের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমরা তিন জনই একসাথে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ঐ স্কুলে পড়ি। আমরা তিনজন যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, তখন আমাদের স্কুলে একজন নতুন শিক্ষক যোগদান করেন। তাঁর বাড়ি ছিল পটুয়াখালী সদর থানায় (বর্তমানে দুমকি থানা)। তখন স্কুলে ছিলেন সাকুল্যে দুইজন শিক্ষক। তাঁরা দুজনেই পালা করে সকল বিষয় পড়াতেন। নতুন শিক্ষকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতেই করা হয়। নতুন শিক্ষক (মরহুম) আফছার উদ্দিন সাহেব স্কুলে যোগদানের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি যা বলতেন, অতিভাবকগণ তা-ই শুনতেন, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতেন না বা দ্বিমত পোষণ করতেন না। ওই শিক্ষকের প্রতি অভিভাবকদের ছিল অগাধ আস্থা। আমাদের পঞ্চম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার পর আমরা কোনো হাই স্কুলে ভর্তি হব না। আফছার